পাখির খাতা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

পাখির খাতা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

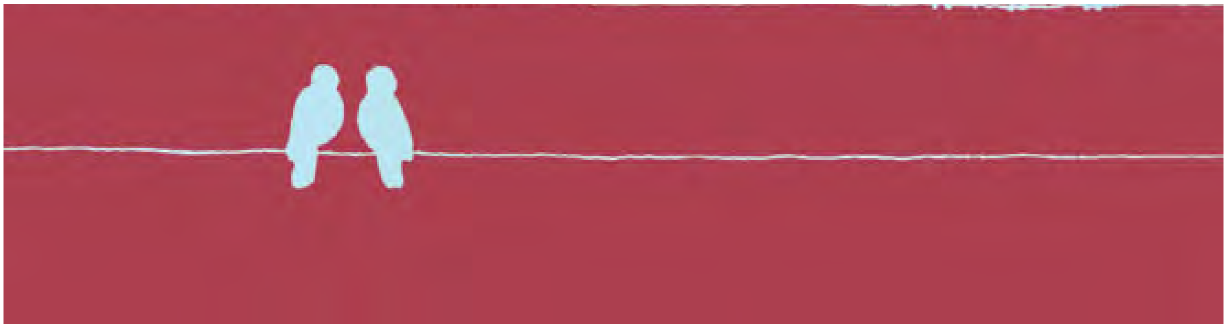

পাখির খাতা

অমরেন্দ্র চ. বর্তী

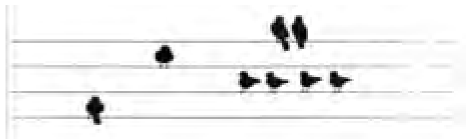

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯
ফোন ২২৮৩ ২৩২০, ২২৯০ ০০০৮
ফ্যাক্স ২২৮৭-৬৪৪৮

Pakhir Khata

A story book for children by Amarendra Chakravorty

প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৯১ (৩০০০ কপি)

ি.তীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ (২২০০ কপি)

তৃতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৯৫ (১৩৩০০ কপি)

চতুর্থ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৩ (১১০০ কপি)

পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১২ (১১০০ কপি)

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

দেবব্রত ঘোষ

ISBN : 81-86891-09-9

প্রকাশক

সর্বাণী চক্রবর্তী

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন

কলকাতা-৭০০ ০১৯

মুদ্রক

জয়শ্রী প্রেস

৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড

কলকাতা-৭০০ ০০৯

হরফ বিন্যাস

স্বর্ণাক্ষর

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

অন্যান্য ছোটদের বই

হীরু ডাকাত
(শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত)
শাদা ঘোড়া
গৌর যাযাবর
তালগাছের ডোঙা
হরিণের সঙ্গে খেলা
আমার বনবাস
ঋষিকুমার
আমাজনের জঙ্গলে
টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
ভূতের বাঁশি
বরফের বাগান

পাখির খাতা

উৎসগ.

পাখির ডাক

পাখির ডানা

যাদের ডাকে

লেখাগুলি যুগান্তর-এর ‘ছোটদের পাততাড়ি’তে ১৯৭৭-৭৯র মধ্যে প্রথম প্রকাশিত

সূচি

খুঁজে .দখ, বুঝে দেখ

সাকটুম

ছার্চোপ্পর

কেমনজা কেমনজা

পাখির রামায়ণ

জন্মট্টান উজবেকিট্টান

পাখির কষ্ট

শান্টিনিটিন

জোছনা ছোঁয় না

শালিখের অসুখ

পাখির রাগ

পাখির খাতা

খুঁজে .দখ, বুঝে দেখ

পাখি নাকি কথা বলে না? সব পাখিই কথা বলে । ওই যে টুঁই-টুঁই-টুঁই-উ, কিঁও-কিঁউ-কিঁও, নুপুর-নুপ নুপুর-নুপ করে শব্দ করে ওগুলো তবে কী? ওগুলোই ওদের কথা । ওদের ভাষা আমরা বুঝতে পারি না বলে আমরা সবজান্তার মতন বলি, পাখিরা কিচিরমিচির লাগিয়েছে । তুমি কি মাদ্রাজের লোকেদের কথা বুঝতে পারো? দুটো গ্রীক ছেলে মার্বেল গুলি নিয়ে ঝগড়া করলে তুমি কি তা বুঝতে পারবে? অতো দূরে যাবারই বা দরকার কী । চার-পাঁচজন চাটগাঁর লোক নিজেদের মধ্যে মনের খুশিতে কথা বলছেন, তাও কি বুঝতে পারবে?

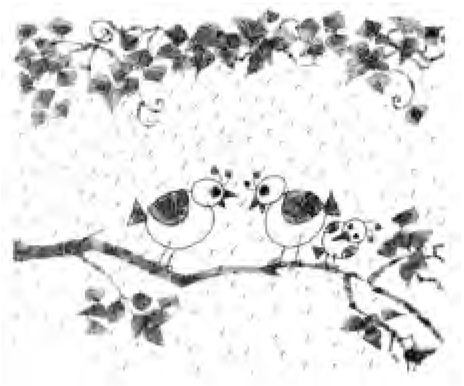

পাখিদের কথা লিখে-লিখে আমার বলে একটা খাতাই ভরে গেছে । কত রকম পাখির কত কথা আমি শুনেছি । এই তো সেদিন, আমি সকালবেলা টগরফুল তুলছি, দেখি ডালে একটা পাখি বলছে, ‘উচ্চিংড়ে কই? উচ্চিংড়ে নেই!’ শুনে ওপরের ডাল থেকে আরেকটা পাখি বললো, ‘খুঁজে দেখ, বুঝে দেখ!’ নিচের ডালের পাখিটা একটু নেচে-নেচে এডাল-ওডাল করে বললো, ‘খুঁজেছি, বুঝেছি । উচ্চিংড়ে কই? উচ্চিংড়ে নেই!’ ওপরের পাখিটা ‘কী জ্বালা, কী জ্বালা’ বলতে-বলতে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল ।

আরেকদিন, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, দেখি একটা রাধাচূড়াগাছের ডালে বসে একটা পাখি আরেকটা পাখিকে বলছে, ‘খোল ছাতা, গোল ছাতা!’ যাকে বলছে তার গায়েও তো বৃষ্টি লাগছে, সে একটু বিরক্ত হয়ে বললো, ‘মুই ক্যান, তুই আন, গোল ছাতা, মান পাতা ।’ মান পাতা মানে জানো তো? মানকচুপাতা । ওইটুকু পাখি, অতো বড়ো পাতা বয়ে আনা কি তার কাজ । সে-ও এবার রেগে গিয়ে বললো, ‘ঝি না কি? ঝি না কি?’ দুজনে যখন ওরকম ঝগড়া করছে, তখন ওদের বাচ্চা পাখিটা মায়ের ডানার নিচে আরো ঘেঁষে এসে

মাকে বললো, ‘কী এতা? কী এতা?’ কী এতা মানে এটা কোন দেশ? ও এখনো দেশ বলতে শেখেনি তো, আর খুব ছোট বলে ‘এটা’ কে বলে এতা । মা তো বৃষ্টিতে বিরক্ত হয়েই ছিল, বললো, ‘কলকাতা । ছাইছাতা!’ এরকম কত কথাই যে বলে পাখিরা ।

‘বউ কথা কও, বউ কথা কও’ তুমি শোনোনি? চৈত্রমাসে গ্রামের পুকুর-দীঘি, মাঠ-ঘাট সব যখন শুকিয়ে খটখট করছে তখন তৃষ্ণার্ত চাতক পাখি ‘মেঘ দে, জল দে’ বলে-বলে গলা শুকিয়ে ফেলছে, তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো? আর জ্যোৎস্নারাতে চোখ-গেল-পাখি ‘চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল’ বলতে-বলতে যখন দূরের দিকে উড়ে যায় তখন আমার বুকের মধ্যে কী-যে কষ্ট হয়! জ্যোৎস্নায় ওদের চোখের কষ্ট অতো কেন বাড়ে সেটা আমি এখনো ভেবে পাইনি ।

সাকট্টম

মাইথনে একটা পাখির সঙ্গে দেখা হলো, উঃ, সে যা কথা বলতে পারে! আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেছি ।

পাখিটার যেমন রঙের বাহার, তেমনি মিষ্টি গলা । মুখে একেবারে খই ফুটছে । আমি বৃষ্টিতে ভিজে পাহাড়ী পথ বেয়ে সবে পাহাড়ের ওপরের বাড়িটায় পৌঁছে একটু-একটু হাঁফাচ্ছি, দেখি, পাহাড়ের গাছপালা থেকে বেরিয়ে এসে ছোট্ট একটা রঙটুকটুক পাখি আমার ঘরের সামনের আকাশে ঘুরে-ঘুরে বলছে, 'সাকট্টম, সাকট্টম!' সাকট্টম মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, স্বাগতম । বিয়েবাড়ির গেটে লেখা থাকে দেখোনি? আমি এখানে এসেছি বলে পাখিটা খুশি হয়ে আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে । অতো সুন্দর করে আর কোনো পাখিকে আমি স্বাগতম বলতে শুনিনি, ঠিক টুং টাং বাজনার মতন । আমি ভিজে গায়েই ব্যাগ থেকে আমার খাতা বের করে সাকট্টম কথাটা বানান করে-করে লিখে রাখছি, হঠাৎ শুনি পাখিটা বলছে, 'জলজঙল, কেমনজা! জলজঙল, কেমনজা ।' তার মানে, জলজঙ্গল, কী মজা! এদিকে পাহাড়, ওদিকে পাহাড়, বাড়িটাই তো পাহাড়ের গায়ে, তিনদিকেই পাহাড় ভরতি জঙ্গল, আর নিচে, ঠিক আমার সামনেই অনেক দূর অব্দি অজয়-বরাকর-দামোদর নদীর জল বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে- এরকম জায়গায় কার না আনন্দ হয়! আমি এসেছি বলে পাখিটাও খুব খুশি । মনের আনন্দে নেচে-নেচে আমার কাছে নিজের দেশের গুণগান করছে ।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে আমি তো অবাক । দেখি, মাথার ধারের জানলায় পাহাড় থেকে একটা গাছের ডাল মুখ বাড়িয়ে আছে আর সেই ডালে বসে সেই ছোট্ট পাখিটা গান গেয়ে-গেয়ে বলছে, 'জল রঙোলো, জাগ লো জাগ । জল রঙোলো, জাগ লো জাগ ।'

পাখিটাই তাহলে গান গেয়ে আমার ঘুম ভাঙিয়েছে! জল রঙোলো মানে তো জল রাঙা হলো । আমি দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি, তিন নদীর জলের ওপর অনেক দূরে একটা লাল টকটকে বল চুপ করে ভেসে রয়েছে । ওটাই সূর্য । একটু-একটু করে আকাশে উঠছে । অমনি করেই তো ভোর হয় । ভোরের সাত রং লেগে নদীর জল একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে । আকাশে, জলে সে যে কী দারুণ রং, যে নিজের চোখে দেখেনি, তাকে বোঝানো যাবে না । আমি দু-চোখ ভরে দেখছি । নিশ্বাস নিতেও ভয় হয়, পাছে নিশ্বাসের হাওয়া লেগে রং নড়ে যায়! আকাশভরা, নদীভরা সে এক বিরাট রং ।

দেখছি তো দেখছিই, হঠাৎ আমার মাথার ওপর পাখির টুং টাং কথা কানে এলো- 'মুখে মাখো না, গায়ে মাখো! আমি মাখিনি? গায়ে মাখো!'

সত্যিই যদি পাখিটার মতো এই রং গায়ে মাখতে পারতাম!

ছার্চোপ্পর

সারাদিন গুমোট গরম । শেষরাতে সেই যে একটু বৃষ্টি হয়ে ভোরবেলাটা একটু ঠান্ডা হয়েছিল, বেলা বাড়তেই আবার যে-কে সেই । চড়া রোদে গাছপালা পর্যন্ত ধুঁকছে ।

আমি একটা আগুন-ঢালা বিরাট মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কাকেদের 'আ! আ!' শুনে রোদ ভুলে দাঁড়িয়ে পড়লাম । দেখি দুটো কাক গরমের কষ্টে 'আ! আ!' করতে-করতে মাঠে নামলো । মাঠের ছোটো একটা গর্তে শেষ রাতের বৃষ্টির জল জমে আছে, কাক দুটো সেই জলে চান করতে এসেছে ।

গর্তের পাড়ে বসে কাক দুটো একসঙ্গে গর্তের জলে একবার করে মাথা ডুবোয় আর আকাশের দিকে মুখ তুলে বলে, 'আ! আ!' এটা আরামের আ-আ । গরমে চান করতে পেরে কার না প্রাণ ঠান্ডা হয়!

তারা চান করেই চলেছে, দেখে মনে হয়- সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তারা বুঝি জল ছেড়ে নড়বে না । এমন সময় কোত্থেকে একটা হাঁড়িচাচাপাখি এসে সেই গর্তের জলে ডুব দিতে গেল । দেখে কাক দুটো একসঙ্গে, 'যা, যা' বলে হাঁড়িচাচাকে তেড়ে গেল । হাঁড়িচাচা তো ভয়ে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে গরমে হাঁসফাঁস করতে লাগলো । তারপর একটু দম নিয়ে রাগে গরগর করতে-করতে বললো, 'ছার্চোপ্পর! ছার্চোপ্পর!' ছার্চোপ্পর মানে স্বার্থপর ।

কথাটা দুটো কাকেরই কানে গিয়েছিল । তারা চান থামিয়ে 'ক্যায়া? ক্যায়া?' বলে হাঁড়িচাচার পিছু ধাওয়া করলো ।

হাঁড়িচাচা এবার প্রাণের ভয়ে সুরুৎ করে উড়ে এসে আমারই কাঁধে বসে বলে উঠলো 'বাঁচাও, বাঁচাও ।'

আমি দেখলাম কাক দুটো আমার মাথার ওপর খুব কাছেই ঘোরাঘুরি করছে । আমি কাঁধ থেকে পাখিটাকে নামিয়ে হাত দিয়ে ঢেকে রাখলাম । কাক দুটো তখন সুর করে বলতে লাগলো, 'বা, বা! বা, বা!' তার মানে কাক দুটো বলতে চাইছে, তুমি শুধু হাঁড়িচাচার দিকটাই দেখলে, ও যে আমাদের স্বার্থপর বলে গাল দিলো সে-বেলায় কিছু নয়!

কেমনজা কেমনজা

বাচ্চা পাখিরা দুষ্টুমি করলে, কথা না-শুনলে যখন-তখন এটা চাই ওটা চাই বলে কিচিরমিচির জুড়লে, মা-পাখিরা কী বলে তাদের ভয় দেখায় জানো? ‘উর্জাজ যায়, উর্জাজ আয়, মোর ছা নে, মোর ছা নে ।’ তার মানে, উড়োজাহাজকে ডেকে বলে, আমার ছানাটাকে নিয়ে যা তো রে!

পাখিরা কিনা উড়োজাহাজকে ভয় পায় । অতো বড়ো ডানাওলা জিনিষটাকে আকাশে উড়তে দেখলে ভয় পাবারই কথা । তারা তো আর বোকা নয় যে উড়োজাহাজকেও পাখি বলে ভাববে । আগে বড়ো পাখিরাও খুব ভয় পেতো, অনেক দিন দেখে-দেখে তাদের সয়ে গেছে । বাচ্চা পাখিরা কিন্তু উড়োজাহাজকে এখনো খুব ভয় পায় । ‘উর্জাজ যায়, উর্জাজ আয়’ শুনেই তারা বায়না থামিয়ে চোখ বুজে ছোট্ট মাথাটা গায়ের পালকের মধ্যে যতোটা পারে গুঁজে দেয় ।

আমাদের লেবুগাছে একসঙ্গে অনেকগুলো পাখি কাছাকাছি বাসা বেঁধে বাস করে । প্রতি বছর বৈশাখ মাসে আমি সারাদিন গাছতলায় বসে বাচ্চাদের নানান বায়নাক্কা শুনি । একদিন শুনলাম একটা বাচ্চা পাখি চিঁ চিঁ করে তার মাকে বলছে, ‘কেঁচো না, কেঁচো না, চা-পোকা, চা-পোকা ।’ কেঁচো খাবে না, খাবে চা গাছের পোকা । তার মা তাকে কত করে বোঝাচ্ছে, ‘কেঁচো খা, খা খোকা । কাল খাস চা-পোকা । কই হাঁ, দেখি হাঁ ।’ হাঁ করতে বললে কী হবে, বাচ্চা কিছুতেই ঠোঁট খোলে না ।

আরেক দিন শুনি একটা বাচ্চা জেদ ধরেছে, এখনই তাকে কুঁচ ফল এনে দিতে হবে । ‘কুঁচ কই, কুঁচ নাল, কুঁচ কই, কুঁচ নাল’ বলে বাড়ি মাথায় করবার জোগাড় । নাল কাকে

বলে জানো? লালকে।

পাখিরা ডায়মন্ডহারবারকে বলে টানমন্বার। একদিন, সেদিন খুব জ্যোৎস্না, অতো জ্যোৎস্নায় কি কারো ঘরে থাকতে ভালো লাগে! আমি বাইরে এসে দেখি লেবুগাছটা চিকচিক করছে, জ্যোৎস্নায় একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে। চুপি-চুপি গাছটার খুব কাছে এসে দেখলাম, কোনো সাড়াশব্দ নেই। পাখিরা তো সন্ধ্যে হতেই ঘুমিয়ে পড়ে। আমি লেবুগাছের সামনে দাঁড়িয়ে আলো-চিকচিক চারদিক দেখতে থাকি।

একটু পরেই শুনি, বাচ্চা একটা পাখি বলছে, 'টানমন্বার যাই, কেমনজা কেমনজা, টানমন্বার যাই।' কেমনজা মানে কী মজা। এতো রাত্তিরে অতোটুকু বাচ্চা ডায়মন্ডহারবার যাবার তোড়জোড় করছে, সখ তো কম নয়। বার-বার 'কেমনজা, কেমনজা' শুনে কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় তার মা ভারি বিরক্ত হয়ে ধমকে দিলো, 'চুপ যা, ঘুম যা!' বাচ্চা পাখিটা ধমক কানেই তুললো না, সে খালি বলে, 'কেমনজা, কেমনজা।' তার মা এবার আরো রেগে বললো, 'পাজি ছা, আজই যা।' বাচ্চাটা কিন্তু সত্যি-সত্যি যাবার নামই করে না, শুধু 'কেমনজা, কেমনজা' করতে থাকে। মা-পাখিটা এবার ভীষণ রেগে তার মাথায় ঠোঁট দিয়ে একটা ঠোক্কর দিলো। বাচ্চাটা ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে বসে কিচিরমিচির কান্না জুড়লো। এতোক্ষণ সে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল, স্বপ্নে ডায়মন্ডহারবার যাবার মজাটা মাঠে মারা গেলো দেখে কিছুতেই তার আর কান্না থামে না। তারপর তার মা যেই বলেছে 'উজার্জ যায়, উজার্জ আয়' অমনি সে কান্নাটান্না ভুলে পালকের মধ্যে মুখ লুকলো।

সেই থেকে আমি প্রায় রোজই সন্ধ্যেবেলা লেবুতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকি যদি পাখিদের স্বপ্নের কথা শোনা যায়।

পাখির রামায়ণ

বর্ধমানের বার্নপুরে নেহরু পার্ক বলে একটা পার্ক আছে । আসল নাম লামার পার্ক । লামার নামে এক জার্মান সাহেব ওটা বানিয়েছিলেন । দামোদরের পাড়ে গোটা একটা গ্রামের মতন অনেকখানি জায়গা জুড়ে কী বিরাট আর কী সুন্দর ওই পার্ক । কতোরকম গাছ-গাছালি । পাথর দিয়ে বানানো ছোট-ছোট পাহাড় । কোথাও হ্রদ । কোথাও ফুলের মেলা । ঘুরতে ঘুরতে একবার মনে হয় কাশ্মীরে এলাম, একটু এগিয়েই মনে হয়- আরে, এ তো রাজস্থান! পার্কের এক-এক দিকে এক-একরকম ।

দু-চোখ ভরে দেখে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ শুনি, বুড়ো মতন একটা পাখি কান্না-কান্না গলায় বলে চলেছে, ‘হা রাম, হা লক্ষ্মণ! হা রাম, হা লক্ষ্মণ!’

মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখি, একই ডালে অনেকগুলো পাখি ভিড় করে বসে আছে । এগুলো কী পাখি? আগে কখনো দেখি নি তো । একটা পাখি বললো- ‘কোথা যাস বাপ? বনবাসে বাপ? বনবাসে সাপ । বনবাসে তাপ ।’

শুনে ছোট-ছোট দুটো পাখি ডাল ছেড়ে অল্প একটু উড়ে গিয়ে বললো, ‘পঞ্চকূট ওই, পঞ্চকূট ওই ।’

আরেকটা পাখি, সে-ও ছোট্ট, বলে উঠলো, ‘তিনজনে যাই, ভিন বনে যাই ।’

আমি এতোক্ষণে সব বুঝতে পারলাম । এ তো রামায়ণের গল্প! ওই বুড়ো পাখিটা দশরথ, আর ছোট তিনজন নিশ্চয়ই রাম লক্ষ্মণ সীতা! কিন্তু পাখিরা এসব জানলো কী করে? পাখি কখনো বই পড়তে পারে? তবে কি রামায়ণের রাম লক্ষ্মণ সীতা দশরথ সবাই এ-জন্মে পাখি হয়ে জন্মেছে?

ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, যে পাখিটা ‘কোথায় যাস বাপ?’ বলছিল, সে বলছে, ‘যাবি যদি, খাবি কী? যাবি যদি, খাবি কী?’

আরেকটা পাখি তার কথায় সায় দিয়ে বললো, ‘ফুল নাই, ফল নাই, পঞ্চকূটে পোকা নাই ।’

ডালের শেষ মাথায় কুঁজো মতন, বিচ্ছিরি চেহারার একটা পাখি বসেছিল, বলে উঠলো- ‘কামরাঙা করমচা । কত আছে ফড়িং-ছা । যা না বাছা, আজই যা ।’

এ নিশ্চয়ই কুঁজি-বুড়ি মন্থরা! এর জন্যেই তো রামকে বনবাসে যেতে হয়েছিল । দেখলাম, মন্থরার কথা শুনে এক সঙ্গে অনেক পাখি ‘না না, না না’- বলতে লাগলো, আর বুড়ো পাখিটা ঠোঁট দিয়ে নিজের বুক ঠোকরাতে-ঠোকরাতে শুধু হায়-হায় করতে লাগলো ।

আমি তো অবাক । রামায়ণ কি তাহলে পাখিদেরই কাহিনী । বাল্ভমীকি পাখিদের এইসব ঘটনা দেখেই কি রামায়ণ লিখেছিলেন?

মাথার ওপর ডানা ঝাপটানোর শব্দে মুখ তুলে দেখি, তিনটে পাখি দামোদরের ওপারের দিকে উড়ে যাচ্ছে । সেখানে বিরাট একটা পাহাড় ঝাপসা নীল । এত দূর থেকে মনে হয় যেন কুয়াশার মধ্যে বিরাট একটা হাতি দাঁড়িয়ে আছে । আমার পাশ দিয়ে একটা মালী যাচ্ছিল । আমি বললাম- 'ওটা কী পাহাড়?'

-'ও তো পঞ্চকূট!' বলে সে তার কাজে চলে গেল ।

পঞ্চকূট? রামেরা তো চিত্রকূট পাহাড়ে গিয়েছিল । আর পঞ্চবটী বনে । রামায়ণ যদি আসলে পাখিদেরই গল্প, তাহলে ওই তিনটে পাখি পঞ্চকূটের দিকে উড়ে যাচ্ছে কেন? আর এই জায়গাটার নামও তো কই অযোধ্যা নয়, এ তো বর্ধমানের বার্নপুর!

পাখিদের রামায়ণ দেখে মানুষের রামায়ণ লিখতে বসে বাল্ভমীকি নিশ্চয়ই জায়গার নাম-টাম একটু-আধটু বদলে দিয়েছিলেন । এটা যে আসলে পাখিদেরই গল্প, পাছে কেউ বুঝতে পেরে যায়!

জন্মট্টান উজবেকিট্টান

শীতকালে কলকাতায় কত যে বিদেশী পাখি আসে, কেউ তা গুনে শেষ করতে পারে না। হাজার রঙের হাজার-হাজার পাখি দলে-দলে কত দূর-দূর দেশ থেকে প্রতি বছর ঠিক একই সময়ে উড়ে আসে। সবচেয়ে আশ্চর্য, পাখিদের কখনো পথ ভুল হয় না। এরোপ্লেন পর্যন্ত কুয়াশায় পথ হারিয়ে অচেনা সাগরে, মরুভূমিতে নেমে পড়ে। আমি তো একবার সামান্য ডিমাপুর থেকে হাফলং যেতেই ভুল ট্রেনে উঠে লামডিং জংশনে নেমে পড়েছিলুম। অথচ পাখিরা দ্যাখো, সেই কোন সাইবেরিয়া থেকে, সুইজারল্যান্ড থেকে পথ চিনে-চিনে হাজার-হাজার মাইল আকাশ সাঁতরিয়ে ঠিক কলকাতায় পৌঁছে যায়। ওদের না আছে কম্পাস, না আছে মানচিত্র। তার ওপর ভাবো, অতোটা পথ উড়ে আসে শুধু একটু বেড়াবার জন্যে। বেড়ানোও হয়, আবার নিজেদের দেশের হাড়কাঁপানো শীতের হাত থেকেও বাঁচে। আমাদের শীতকাল তো ওদের কাছে বসন্তকাল।

চিড়িয়াখানায় ঘুরে-ঘুরে আমি এরকম প্রচুর পাখি দেখছি আর এইসব ভাবছি, এক জায়গায় শুনি, আমাদের সুন্দরবনের একটা পাখি বলছে, 'জন্মট্টান? জন্মট্টান?'

তার সামনেই খুব সুন্দর একদল বিদেশী পাখি ঠোঁট দিয়ে পালক-টালক ঠিক করছিল। মনে হয়, এরা সবে এসে পৌঁছেছে। অতোটা পথ উড়ে এসেছে তো, হাওয়ায়

পালকগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে, তাই বোধহয় ঠোঁট দিয়ে ঠিক করে নিচ্ছে, সুন্দরবনের পাখিটা দেখলুম টুক-টুক করে লাফিয়ে-লাফিয়ে এই পাখির দলের কাছে এসে দাঁড়ালো। বার-কতক তার ছোট্ট ঘাড় বাঁকিয়ে ওদের ল্যাজ থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে আবার বললো, 'জন্মট্টান? জন্মট্টান?'

বুঝেছো? বিদেশী পাখির দলটাকে ওদের জন্মস্থান কোথায় জিজ্ঞেস করছে।

ওদের মধ্যে একটু গম্ভীর ধরনের একটা পাখি পালক সাফ করা থামিয়ে বললো, 'উজবেকিট্টান, উজবেকিট্টান, উজবেকিট্টান।' উজবেকিস্তান বলে একটা জায়গা আছে না? ওরা আসলে সেখানকার পাখি।

সুন্দরবনের পাখিটা মনে হয় চিড়িয়াখানার পাখিদের দলপতি। ডানা নাচাতে-নাচাতে খানিক উড়ে গিয়ে আরেক দল বিদেশী পাখিকে ওইরকম করে তাদের জন্মস্থান জিজ্ঞেস করলো।

কী সুন্দর রং সেই পাখিগুলোর। শাদা, কালো, হলুদ, বেগুনী রঙে একেবারে ঝলমল করছে। আর ল্যাজের সে কী বাহার। ঠিক ছোট্ট জাপানি পাখার মতন। আমার খুব ইচ্ছে করছিল, একটুখানি গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। কিন্তু সেটা হয়তো ঠিক হবে না। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুধু দেখতে লাগলুম। দেখলুম, মাথায় হলুদের মধ্যে বেগুনি রেখা-ওলা একটা পাখি নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করলো। সে-ই বোধহয় এদের দলপতি। পাখিদের সব দলেই দেখছি একজন করে দলপতি থাকে। তো, সেই বেগুনি-ডোরা পাখিটা সুন্দরবনের পাখির কাছে এসে ভারি মিষ্টি করে বললো, 'ম্যানচেট্টার ম্যানচেট্টার।'

তার মানে ম্যানচেস্টার। পাখিদের ঠোঁটে মাঝের স-টা ঠিক আসে না। ফরাসিরা যেমন হসপিটালকে ওপিতাল বলে, একবার বলেছিলুম না?

উঃ, কত দেশের কত যে পাখি! চিড়িয়াখানায় একেবারে পাখির মেলা বসেছে। আর কত যে রং। চোখের পলক ফেলতেও ইচ্ছে করে না।

সত্যিই, একসঙ্গে এত পাখি, মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছি। হঠাৎ শুনি 'থাকছো ক দিন? থাকছো কত দিন?' বলতে-বলতে সাত-আটটা এদেশী পাখি কোত্থেকে উড়ে এসে আমার বুক ঘেঁষে খানিক এগিয়ে ডানা গুটিয়ে ঝুপ-ঝুপ করে নেমে পড়লো। ম্যানচেস্টারের দলটার ঠিক সামনেই। পাখিদের একটা সুবিধে, যে যে-ভাষাই বলুক না কেন, এক-দেশের পাখি আরেকদেশের পাখির ভাষা বুঝতে পারে। 'থাকছো ক দিন?' শুনে ম্যানচেস্টারের দলপতি এবারও খুব মিষ্টি করে বললো, 'হোলুইনটার, হোলুইনটার।'

তার মানে গোটা শীতকালটা।

পাখির কষ্ট

একেক সময় আমার মনে হয়, মানুষের দুঃখ-কষ্ট মানুষের চেয়ে পাখিরাই বেশি বোঝে। একবার আসামের এক গ্রামে, মাঘ মাসে খুব শীত পড়েছে, তার ওপর সকাল থেকে মেঘলা আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি। উঃ, সে কি হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। কেউ আর ঘর থেকে বেরুতেই পারে না। চাষীরাও সেদিন মাঠে যায়নি। লোকে কাজে না বেরুলে খাবে কী? শীতের চোটে কাজকর্ম খাওয়া-দাওয়া সব মাথায় উঠেছে। সারা গ্রামের লোক যে যার মাটির ঘরে দরজা-জানলার ঝাঁপ টেনে দিয়ে কাঁথা-টাথা জড়িয়ে শুধু হি-হি করে কাঁপছে। সেই গ্রামে বেড়াতে গিয়ে আমিও ওরকম একটা কুঁড়েঘরে আটকে পড়েছি, হঠাৎ শুনি, বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে একটা পাখি 'কীচচিত কীচচিত কীচচিত কীচচিত' বলতে-বলতে উড়ে গেল। কীচচিত নিশ্চয় বুঝেছ, কী শীত।

কীচচিত শুনে আমাদের ঘরের ঠিক পেছনেই বাঁশবন থেকে আরেকটা পাখি দুবার 'আহা রে, আহা রে' করে উঠে, সুর করে টেনে-টেনে বলতে লাগলো, 'আ-হা! খাবে কী? আ-হা! খাবে কী?'

বলতে-বলতে তার নিজেরই গলা ঠান্ডায় কেঁপে যাচ্ছে।

মাঘের শীতে, বৃষ্টিতে পাখিদেরও তো কষ্ট! বনে-বনে উড়ে বেড়ানোই বলো, আর খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়ানোই বলো, দুটোই তখন অসম্ভব। পাখিটা সেই কষ্টের কথা কিন্তু বলছে না, তার কষ্ট গ্রামের মানুষের জন্যে। নিজেদের কষ্টের কথা বললে নিশ্চয়ই 'খাবে কী' না বলে 'খাবো কী' বলতো।

এ বছর পুজোর সময়ও কলকাতায় একটা পাখির কথা শুনে আমার মনে হলো, পাখিদের মনে মানুষের চেয়ে দয়ামায়া অনেক বেশি।

সেদিন অষ্টমী।

দুর্গা ঠাকুরের সামনে অনেকক্ষণ ধরে নেচে-নেচে ঢোল বাজিয়ে ঢুলীদের হাত ব্যথা হয়ে গেছে, তারা কাঁধ থেকে ঢোল নামিয়ে চাটাইয়ে বসে বিশ্রাম করছে। ছোট্ট একটা ছেলে দুলে-দুলে কাঁসর ঘন্টা বাজাচ্ছিল কাঁই না-না, কাঁই না-না, সঙ্গের ঢুলীদের থামতে দেখেও তার কাঁসর থামাতে ইচ্ছে করছে না। একদম মশগুল হয়ে সে একাই বাজিয়ে চলেছে কাঁই না-না, কাঁই না-না, নাই মানা, নাই মানা।

বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছেই, হঠাৎ প্যান্ডেলের কলাগাছে কোত্থেকে একটা পাখি উড়ে এসে ডেকে উঠলো, 'বন্যা না, বন্যা না?'

পাখির ডাক ছেলেটার কানে যায়নি, সে দুলে-দুলে বাজিয়েই চলেছে কাঁই না-না, কাঁই না-না । দেখে পাখিটা এবার আরো জোরে-জোরে বলে উঠলো, ‘বন্যা না, বন্যা না?’ ছেলেটা যতই বাজায় কাঁই না-না, কাঁই না-না, পাখিটাও তত চেঁচায়, ‘বন্যা না, বন্যা না?’

বুঝতে পেরেছো? পুজোর ঠিক আগেই খুব বন্যা হয়ে গেল না? চার দিনের বৃষ্টিতে পশ্চিম বাংলার কত যে গ্রাম জলে একদম ডুবে গিয়েছিল, কত লোকের ঘর-বাড়ি ভেসে গিয়েছিল, আমার সাধ্য কী, সে-সব দুঃখের কথা লিখি! সেই দারুণ বন্যার পর খুব আলো-টালো জ্বালিয়ে, গান-বাজনা করে পুজোয় উৎসব করা কি উচিত? পাখি তাই বলছে ।

শান্টিনিটিন

শান্তিনিকেতনকে পাখিরা কী বলে জানো তো? 'শান্টিনিটিন ।' শান্তিনিকেতনের একটা বাগানে দেখলুম একটা পাখি একা-একা গাছের ডালে বসে আপন মনে দিব্যি মুখ তুলে গাইছে, 'আমানডের শান্টিনিটিন, আমানডের শান্টিনিটিন ।'

'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটার বাকি কথাগুলো জানে না তো, ঘুরে-ফিরে ওই একটা লাইনই মশগুল হয়ে গেয়ে চলেছে ।

বুড়োমতন একটা পাখি, বৃষ্টিতে ভিজে তার একটু জ্বর হয়েছিল, কাছেই তার আমড়াগাছের বাসায় শুয়ে ছিল, বার-বার একই গান শুনে অতি কষ্টে বাইরে এসে বললো, 'গীতাঞ্জলি গা না, গীতাঞ্জলি গা ।'

গায়ক পাখিটা প্রথমে শুনতেই পায়নি, গীতাঞ্জলির কথাটা আরেকবার বলতে সে গান থামিয়ে বলে উঠলো, 'জানি নাকি? জানি না । জানি নাকি?'

বুড়ো পাখিটা বললো, 'গীতিমাল্য গা না, গীতিমাল্য গা ।'

সেই পাখিটা গলা তুলে আবার 'আমানডের শান্টিনিটিন' ধরতে যাচ্ছিল । বললো, 'জানি নাকি? জানি না । জানি নাকি?'

জ্বরে ভুগে মানুষের মতন পাখিরাও একটু জেদী হয়ে যায় । বুড়ো পাখিটা নাছোড়বান্দার মতন বললো, 'গীতালিটো গা না, গীতালিটো গা ।'

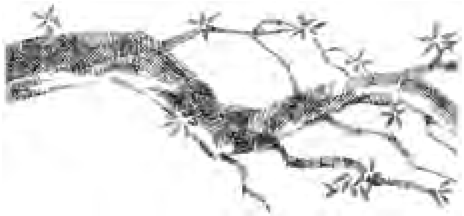

গীতালিটো মানে গীতালিটা । কোনো-কোনো গ্রামের লোককেও আমি এ রকম টা-এর বদলে টো বলতে শুনেছি । একবার একটা গ্রামের হাটে একটা লোককে বলতে শুনেছিলুম, 'শাড়িটোর দাম বড্ড বেশি বলছো খুড়ো ।'

গীতালির গান গাইতে বলায় গায়ক পাখি এবারও মাথা নাড়লো । আগের মতোই বললো, 'জানি নাকি? জানি না । জানি নাকি?'

জ্বর-টর হলে আমারও খুব গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি বইয়ের গান শুনতে ইচ্ছে করে । আহারে, একটুখানি গান শোনার জন্যে বুড়ো পাখিটা একেবারে ছটফট করছে ।

শেষে আর থাকতে না পেরে, ‘থাক তুই, থাক বাছা । মুই যাই ছাতিমলা ।’ বলতে-বলতে বুড়ো পাখিটা দুর্বল ডানায় ছাতিমতলার দিকে উড়ে গেল ।

জোছনা ছোঁয় না

সূর্য আকাশের পশ্চিম দিকে একদম একটা সিঁদুরটিপ হয়ে গেছে। মস্ত বড়ো সিঁদুরটিপ। আরেকটু পরেই টুপ করে ডুবে যাবে। এদিকে পুব-আকাশে গাছপালার আড়াল থেকে গোল চাঁদ উঠে আসছে। পূর্ণিমার দিনে এরকম দেখা যায়। আকাশের একদিকে সূর্য, আর একদিকে চাঁদ। একটা ডুবছে, একটা উঠছে। যেন একসঙ্গে দুটো চাঁদ।

আমি আর তুম্মা আর তুষি মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর একসঙ্গে সূর্য-চন্দ্র দেখছি, হঠাৎ আমাদের চোখের সামনেই সূর্য ডুবে গেল, আর চাঁদটা একটু এগিয়ে একটা দেবদারু গাছের মাথার ওপর চুপ করে এসে বসলো। চাঁদ কখনো এক জায়গায় বসে থাকে? ভালো করে চেয়ে দেখলুম। একটু-একটু করে দূরের তালবনের দিকে চলে যাচ্ছে।

চাঁদের আলোয় চারদিক আলো হয়ে আছে। গাছের পাতা চিকচিক করছে। মাঠের একধারে এক ঝাঁক সন্ধ্যামালতীর গাছ। ঠিক মনে হয় জ্যোৎস্নায় চান করে উঠেছে। পাতায়-ফুলে জ্যোৎস্না একদম লেগে রয়েছে।

তুষি এর আগে কখনো এরকম করে জ্যোৎস্না দেখেনি, সে এক দৌড়ে সন্ধ্যামালতীর ঝোপের কাছে গিয়ে ডাকলো, দিদি, ছুটে আয়। আমরা জোছনা ছোঁবো। ইশ, কী কাছে!

তুম্মা তখন মাঠের মাঝখানে। সে নিচু হয়ে ঘাসে হাত বুলিয়ে বললো, জোছনা তো ঘাসেও লেগেছে। এই তো আমি ছুঁয়েছি।

বলে যেই চোখের সামনে হাত নিয়ে জোছনার রং দেখতে গেছে, অমনি তার কান্না পেয়ে গেল। কোথায় জোছনা, হাতের পাতায় কাদা লেগে রয়েছে।

তুষি অতো দূর থেকে কিছু শুনতে পায়নি, একদম একা জোছনায় হাত দিতে তার ভয় করছে, সে এবার চেঁচিয়ে বললো, দিদি, শিগগির আয়, ফুলের ওপর কতো জোছনা!

তুম্মা তার কাছে যেতে সে ফিসফিস করে বললো, কী সুন্দর দেখ! ছুঁবি?

একদম হাতের কাছেই জোছনা। ফুলের ওপর টলমল করছে। তুম্মা চোখ সরাতে পারে না। তার খুব ইচ্ছে করছে আঙুলে করে একটুখানি জোছনা তুলে নেয়। বললো, তুই আগে ছোঁ তো, দেখি কী হয়!

তুষি যেই একটা ফুলের গায়ে জোছনা ছুঁয়েছে, অমনি পুরো গাছটাই খুব বিরক্ত হয়ে উঠলো। তুষি স্পষ্ট দেখলো, গাছটা দু-বার নড়ে উঠলো। সে হাত গুটিয়ে নিয়ে বললো, থাক দিদি, কাজ নেই।

তুম্মা গাছটার খুব কাছে গিয়ে বললো, দাঁড়া, আমি শুধু একটুখানি জোছনা তুলে নেবো ।

পাতার আড়ালে কোথায় একটা পাখি ছিল, হয়তো তার পাতার বাসায় ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ জেগে উঠে সুর করে ডাকতে লাগলো- জোন্না, নোন্না, জোন্নাই নুন্নাকে ।

হঠাৎ পাখির ডাকে চমকে উঠে তুম্মা-তুষি সরে এলো । তুম্মা আমার কাছে এসে বললো, আচ্ছা, পাখিটা কি আমাদের কিছু বলছে?

তোমরা যারা পাখির ভাষা একটু-একটুও জানো তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো? পাখিটা বলছে, জোছনা ছোঁয় না, জোছনাই ছুঁয়ে থাকে ।

শালিখের অসুখ

'বিনা চিকিচ্ছেয় চিৎপটাং, বিনা চিকিচ্ছেয় চিৎপটাং' বলতে-বলতে একটা শালিখ মল্লিকদের জামরুলগাছের নিচে পায়চারি করছিল । সেই গাছের ডালে তিনটে পাতা সেলাই করে তার মধ্যে একজোড়া টুনটুনি তাদের বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বাস করতো ।

বাচ্চা দুটো খেয়ে-দেয়ে দুপুরবেলা দিব্যি ঘুমোচ্ছিল, আর তাদের মা-বাবা বসে-বসে ভাবছিল রোদটা একটু পড়লে আজ তারা কোন বনে গিয়ে পোকামাকড় ধরবে । এমন সময় শালিখের কথা কানে যেতেই মা-পাখিটা বললো, 'কে বটেন, কে বটেন? সন্টু কি? সন্টু কি?'

অন্য টুনটুনিটার সবে একটা হাই উঠেছিল, হাই তুলতে-তুলতে বললো, 'চিৎপটাং, তার কারণটা কী? কারণটা কী?'

ঠিক সেই সময় শালিখটা আবার বলে উঠলো, 'বিনা চিকিচ্ছেয় চিৎপটাং!'

তখন টুনটুনিটা ঘরের বাইরে এসে শালিখটাকে দেখে বললো, 'কে এটা? চিনটু না?'

শালিখ ওপরের দিকে তাকিয়ে টুনটুনিকে দু-তিনবার পিটপিট করে দেখলো । তারপর বললো, 'চিনটু না, চিনটুর ছোট ঠাকুমা । চিনটু চিৎপটাং । বিনা চিকিচ্ছেয় চিৎপটাং!'

'কারণটা কী? কারণটা কী?'

পাশেই কালোজাম গাছের ডাল থেকে একটা পাখি আপন মনেই বললো, 'কারণ জানে কোন জনা?'

একটা কাক উড়ে যাচ্ছিল । কে চিৎপটাং, কী ব্যাপার- কিছু না বুঝে বলে উঠলো, 'আহা! আহা!'

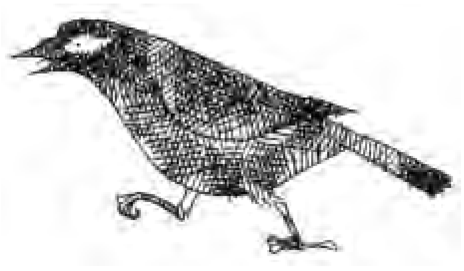

পাখির রাগ

ক'দিন ধরে একটা বনবিড়াল আমাদের পাড়ায় খুব উৎপাত করে বেড়াচ্ছিল । আজ এ বাড়ির মুরগির ছানা খেয়ে যাচ্ছে, কাল ও-বাড়ির পোষা পায়রা সাবাড়, শনিবার রিন্টুদের দু-দুটো খরগোশ শেষ করেছে- এমনি রোজ । আমার মেজদি হাঁসের ছানা নিয়ে খেলতে খুব ভালোবাসে, শুধু সেই জন্যেই খুব যত্ন করে হাঁস পোষে । ডিম ফুটিয়ে ছানা করে । তুলোর গোল্লার মতন ছোট্ট-ছোট্ট শাদা ধবধবে হাঁসের ছানাগুলো সারাদিন উঠোনে ঘুর-ঘুর করে । খুঁটে খুঁটে পোকা-টোকা খায় । সন্ধ্যে হলে মেজদি নিজের হাতে সেগুলোকে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখে দেয় । একদিন ভোরবেলা উঠে ঝুড়ি তুলতে গিয়ে মেজদি চিৎকার করে কেঁদে উঠলো ।

সেদিন আবার মহালয়া । শেষ রাত থেকে বিছানায় শুয়ে শুয়েই আমি মন দিয়ে রেডিয়োয় মহালয়ার গান আর নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ শুনছি, হঠাৎ মেজদির চিৎকারে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি, হাঁসের ঝুড়ি উলটোনো আর ছেঁড়া ফুলের পাঁপড়ির মতন চারদিকে কচি-কচি পালক ছড়িয়ে আছে । বনবিড়ালটা একটা ছানাও আস্ত রাখেনি । অমন ফুটফুটে ছানা আর নেই, এতে কার না কান্না পাবে! তার ওপর মেজদি ওদের বড্ড ভালোবাসতো । উঠোনময় ছড়ানো পালকের মধ্যে দাঁড়িয়ে মেজদির সে কী বুকফাটা কান্না!

এখন হয়েছে কী, একটা জেলে দূরের কোন নদীতে সারারাত মাছ ধরে ভোরবেলা মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরছিল । আমাদের পাড়াটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে মাঠের ধারে জেলেদের পাড়া । লোকটা আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, মেজদির কান্না শুনে দাঁড়িয়ে পড়লো । তারপর আমাদের কাছে এসে পালক-টালক দেখে বললো, এ নিশ্চয়ই সেই বনবিড়ালটার কাজ । পালক দেখে মনে হচ্ছে একটু আগেই ছানাগুলোকে খেয়েছে ।

এতক্ষণে আমি লোকটাকে চিনতে পারলাম । এ তো পঞ্চা জেলে । খুব ভালো লোক । কদিন আগে বনবিড়ালটা রাস্তার মধ্যে পঞ্চা জেলেকে আঁচড়ে-কামড়ে তার হাত থেকে একটা দু-কেজি ওজনের কাৎলা মুখে নিয়ে পালিয়েছিল ।

পঞ্চা জেলের একটা কান ততক্ষণে আপনা-আপনি নড়তে শুরু করেছে । খুব মন দিয়ে কিছু শুনলে তার ওরকম কান নড়ে । কানটা একবার সামনের দিকে মুড়ে আসছে, আবার টান হয়ে যাচ্ছে । এ রকম কয়েক বার হবার পর পঞ্চা হঠাৎ ছাদের দিকে মুখ তুলে চাপা গলায় আমাকে বললো, শুনতে পাচ্ছো? কেমন গরগর করছে । শয়তানটা এখানো ছাদেই আছে । আজ আমার একদিন কি ওরই একদিন ।

বলে হাতের জাল-টাল নামিয়ে রেখে তিন-চারটে করে সিঁড়ি লাফিয়ে সোজা ছাদে । আমিও তার পেছন-পেছন উঠে গেলাম । মাত্র কদিন আগে যে পঞ্চার মাছ নিয়ে গেছে, তাকে সামনে পেয়ে পঞ্চা কি আর ছেড়ে দেবে!

গিয়ে যা দেখলাম, তা কেউ নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না । ছাদের দক্ষিণ কোণে আমাদের ফণিমনসা গাছের পাশেই একটা পাখি দুপায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । বেশ বড়ো পাখি । ডানা দুটোকে দু পাশে টান-টান করে মেলে রেখেছে । ডানার এক-একটা পালক ফাঁক-ফাঁক হয়ে ধারালো ছুরির মতন দুপাশে উঁচানো । আর, কী আশ্চর্য, ছাইরঙের মস্ত বনবিড়ালটা পাখিটার পায়ের নিচে চাপা পরে রাগে গর গর করছে । থাবা থেকে এই বড়-বড় নখ বেরিয়ে এসেছে, মোটা ল্যাজটা একবার এদিকে একবার ওদিকে কাঁপতে-কাঁপছে বেঁকে যাচ্ছে, আর মুখ দিয়ে সে কী গরগরানি! পাখিটা কিন্তু বনবিড়ালকে দু পায়ের ধারালো নখে একদম বিঁধেই রেখেছে ।

পাখিকে কখনো চোখ পাকিয়ে তাকাতে দেখেছো? রাগে চোখ বড়-বড় করে চেয়ে আছে, দেখেছো কেউ? আমি এই প্রথম দেখলাম । চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে । এক দৃষ্টিতে বনবিড়ালটার দিকে চেয়ে আছে আর মাঝে-মাঝে দু-পাশের ডানা গুটিয়ে এনে শক্ত ছুঁচলো পালকের ডগাগুলো এক সঙ্গে সাঁ করে বিঁধিয়ে দিচ্ছে বনবিড়ালটার বুকে । বনবিড়ালটার সারা গা রক্তে মাখামাখি । তবু কি তার গরগরানি থামে । পাখিটার পায়ের তলা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার সে কী চেষ্টা ।

আমি তো আমি, পঞ্চা জেলে পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেছে । কতক্ষণ যে ও রকম চলছিল খেয়াল করিনি, হঠাৎ শুনি পাখিটা ঝমঝমিয়ে গম্ভীর গলায় বলছে, গুন্ডা তুই, তোর মুন্ডু নিই? গুন্ডা তুই, তোর মুন্ডু নিই?

পাখি তো, তাই ভয়ংকর কথাগুলোও ঠিক একটা গম্ভীর গানের মতন শোনাচ্ছিল। কয়েকবার ও-রকম বলে পাখিটা একবার থামলো। চোখ দুটো রাগে ধক-ধক করছে। একটু পরে একই রকম ভীষণ গলায় বলে উঠলো, রাক্ষণ নাশ হোক!

বলেই বনবিড়ালটার মাথায় লম্বা ঠোঁট দিয়ে এক ঠোক্কর। মাথা সঙ্গে-সঙ্গে দু-ফাঁক। সব গরগরানি, ল্যাজ আছড়ানো একদম শেষ।

রেডিয়োয় তখনো নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ হচ্ছে, জেলেপাড়ার দিক থেকে আকাশ জ্বালিয়ে সূর্য উঠছে, পঞ্চা জেলে হঠাৎ গলা ফাটিয়ে 'জয় মা দুগ্গা, দুগ্গতিনাশিনী' বলে ধপ করে ছাদের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। তার দু-হাত কপালে ঠেকানো।

পাখিটা ডানার ঝাপটায় ফণিমনসা গাছ দুলিয়ে আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গেল। আমি পঞ্চা জেলেকে হাত ধরে তুলে বললাম, তুমি ওরকম করলে কেন? পাখিটা বেশ ছিল, হয়তো আরো কোনো কথা বলতো, তোমার চিৎকারেই উড়ে গেল।

পঞ্চা আকাশে মুখ তুলে কপালে হাত ঠেকিয়ে আবার নমস্কার করলো। তারপর বললো, তুমি কি পাখি ভেবেছিলে নাকি? স্বয়ং মা দুগ্গা!

পাখিটা 'রাক্ষস নাশ হোক' বলেছিল বটে, ডানা দুটোও অনেকটা দুর্গার দশ হাতের মতন দেখতে, চোখ তো একদম দুর্গা ঠাকুরের চোখের মতনই রাগে ধক-ধক করছিল, তাই বলে পাখি কখনো ঠাকুর হয়!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে পঞ্চা আমার মনের কথা টের পেয়ে বললো, আগেকার দেব-দেবীরাই তো পরের জন্মে পাখি হয়ে জন্মায়। দেবতারা কোথায় থাকে? আকাশে না? পাখিরাও বেশির ভাগ সময় দেখবে আকাশে থাকতেই ভালোবাসে। আগের জন্মের অভ্যেস কিনা।

পাখির খাতা

একবার একটা পাখি আমার যে কী উপকার করেছিল শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে । যে-খাতাটায় আমি যে-পাখি যখন যা বলে সব লিখে রাখি, আমার সেই খাতাটা একদিন ঝড়ে উড়ে গেল ।

সেদিন দুপুর থেকে লোডশেডিং । তার ওপর কোথাও একটু হাওয়া নেই । গাছপালা সব থম মেরে আছে । অসহ্য গরম । পাশের বাড়িতে একটা বাচ্চা গলা ছেড়ে কাঁদছে । তার মা তাকে 'আয় পাখি ল্যাজঝোলা, খেতে দেবো দুধকলা' এইসব বলে ভোলাবার চেষ্টা করছে, এমন সময় ওদেরই বাড়ির পাঁচিলে বসে একটা পাখি ডেকে উঠলো, 'কান্না না কাটি না, ঝগড়া না ঝাঁটি না । চুপ খোকা, চুপ খোকা, মুখে আর রা-টি না!' শুনে তো আমি অবাক । তক্ষুনি খাতা টেনে নিয়ে লিখতে বসে গেলাম ।

পাখিদের নিয়ে অনেক ছড়া শুনেছি, আমিও দুয়েকটা বানিয়ে-বানিয়ে লিখেছি, কিন্তু পাখির মুখে কেউ কখনো ছড়া শুনেছো? দিব্যি সুর করে-করে ছড়া কাটছে আর মাঝে-মাঝে হঠাৎ একটুখানি থেমে যাচ্ছে । কী ব্যাপার? জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি- মাঝে মাঝে ছড়া থামিয়ে ঠোঁট দিয়ে পালক পরিষ্কার করছে । এপাশ-ওপাশ ঘাড় বেঁকিয়ে শরীর গোল করে মুখটাকে একেবারে ল্যাজ অব্দি নিয়ে যাচ্ছে । লম্ব্যা ল্যাজ । তাতে গাঢ় বেগুনি রঙের পাশাপাশি হলদে আর হালকা বেগুনি । পাখিটা দেখলাম খুব মনোযোগ দিয়ে ল্যাজের পালক ঠিক করছে । মাথার ঝুঁটিতে কিন্তু কিছু করছে না । ঠোঁট দিয়ে তো আর ঝুঁটি ছোঁয়া যায় না । ধবধবে সাদা আর কুচকুচে কালো রঙের ঝুঁটিটা কী যে সুন্দর দেখাচ্ছে কী বলবো ।

ছেলেটা গরমে কেঁদে চলেছে । তার মাও তাকে পাঁচিলের পাখিটা দেখিয়ে কত কী বলে ভোলাবার চেষ্টা করছে । একবার বলছে, ওই দ্যাখ ন্যাজঝোলা পাখি । ওটা নিবি? ওমা কী সুন্দর ঝুঁটি রে! আবার বলছে, আয় তো আয় ল্যাজঝোলা, খেতে দেবো দুধকলা, আমার খোকাকে নিয়ে কর খেলা । এইরকম কত কথা যে বলে যাচ্ছে তার ঠিক নেই ।

খোকা পাখিটাকে দেখতে দেখতে একবার একটু কান্না থামায়, তারপর আবার যে কে সেই। মা-ও আবার সুর ধরে, আয় তো আয় ল্যাজঝোলা। মায়ের কথা শুনে পাখিটাও নতুন করে ছড়া কাটে- কান্না না কাটি না, ঝগড়া না ঝাঁটি না। চুপ খোকা, চুপ খোকা, মুখে আর রা-টি না!

খোকা কিংবা খোকার মা তো আর পাখিটার কথা বুঝতে পারছে না। সবাই কি আর পাখির ভাষা বোঝে!

আমিও ওই 'কান্না না কাটি না', এইসব লিখে বসে বসে পাখিটার কান্ড দেখছি আর ভাবছি ছড়াটার আর দুচার লাইন কি বলবে না?

হঠাৎ দেখি বাচ্চার কান্না থেমে গেছে। হয়তো কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। যাই হোক কান্না থামা মাত্র পাখিটা পাঁচিলের ওপর ল্যাজ বাঁচিয়ে সাবধানে দু-তিন বার নেচে নিয়ে বলে উঠলো, ন্যাজঝোলা, ঝুঁটিওলা, কই দাও দুধকলা।

কথাগুলো তক্ষুনি লিখে নিয়ে মুখ তুলে দেখি, বাচ্চাটা তার মায়ের কোলে চড়ে তাদের জানলার কাছে এসে একহাতে জানলার গ্রিল ধরে ঝুঁকে পাখিটাকে খুব দেখছে। ঘুমোয়নি তাহলে! বাচ্চারা কি পাখির ভাষা বোঝে? কে জানে! তার মা কিন্তু পাখিটা কী বলছে কিছুই বোঝেনি। পাখিটাকে দেখিয়ে বলল, ওমা, কীরকম কিচির-মিচির লাগিয়েছে দ্যাখ।

কলম রেখে এইসব দেখছি আর পাখি ও মানুষকে নিয়ে নানা কথা ভাবছি, হঠাৎ দুদ্দাড় শব্দে দারুণ ঝড়! ঝোড়ো হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে সব তছনছ ক'রে, যাবার সময় আমার খাতাটাকে জানলা দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

ওই খাতায় কতদিনের কত পাখির কত লেখা আছে। সেই খাতা ঠিক একটা বড়ো পাখির মতন ফরফর করতে করতে উড়ে গেল দেখে আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না। ঝড়ের মধ্যেই দরজা খুলে খাতার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটার সঙ্গে ধুলো-কাঁকর এসে চোখে বিঁধছে। ভালো করে চোখ মেলাই ভার। একে তো ঝড়-টড় হলে বিকেলটাকেই মনে হয় সন্ধে, তার ওপর খাতা খুঁজতে খুঁজতে সত্যিকার সন্ধে হয়ে গেল। ঝড়ে, অন্ধকারে, হায়, আমার সেই খাতা এখন কোথায়!

দেখতে দেখতে ঝমঝম করে বৃষ্টি। এমনিতেই খুব বৃষ্টি হলে মানুষের কেন যেন কান্না পায়। তার ওপর ওই খাতা হারিয়ে আমার মনের যে কী অবস্থা, কাউকে বলে বোঝানো যায় না।

বৃষ্টিতে একদম চান করে দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি ফিরছি, হঠাৎ 'খাতা নিন' শুনে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

একটা জবাফুল গাছের ডালে একটা পাখি দুপাশের ডানা মেলে আমার খাতাটাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে। সে-ই 'খাতা নিন খাতা নিন' বলে ডাকছে। কোন পাখিটা, জানো? সেই যে মাথায় ঝুঁটি ল্যাজঝোলা। পাশের বাড়ির পাঁচিলে বসে বলছিল- কান্না না কাটি না, ঝগড়া না ঝাঁটি না, সেইটা।

খাতাটা ওইভাবে ফিরে পেয়ে আমার যে সেদিন কী আনন্দ হলো কী বলবো। আর সেই পাখিটার কথা ভাবো তো। নিজে বৃষ্টিতে ভিজে আমার খাতাটাকে ওভাবে না বাঁচালে আর কি আমি পাখির গল্প লিখতে পারতাম! অতো বৃষ্টিতে খাতাটা কিন্তু একটুও ভেজেনি। ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল কিনা!